প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা

Subject: Honours in Sociology (ESO)
Bachelor Degree Programme (BDP)
Paper - I (Introducing Sociology)
Module-1 : Sociology and Society

প্রথম মুদ্রণ ঃ এপ্রিল, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা

Subject: Honours in Sociology (ESO)

Bachelor Degree Programme (BDP)

Paper - I (Introducing Sociology)

Module-1 : Sociology and Society

: Board of Studies :

Members

Professor Chandan Basu
Director, School of Social Sciences,
Netaji Subhas Open University (NSOU)

Professor Bholanath Bandyopadhyay
Retired Professor, Deptt. of Sociology,
University of Calcutta

Professor Sudeshna Basu Mukherjee
Deptt. of Sociology,
University of Calcutta

Kumkum Sarkar
Associate Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Srabanti Choudhuri
Assistant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Professor Prashanta Ray
Emeritus Professor, Deptt. of Sociology,
Presidency University

Professor S.A.H. Moinuddin
Deptt. of Sociology,
Vidyasagar University

Ajit Kumar Mondal
Associate Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Anupam Roy
Assistant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

: Course Writer :

Dr. Sumana Goswami
Assistant Professor in Sociology
Govt. General Degree College, Singur

: Course Editor :

Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor in Sociology
NSOU

: Format Editor :

Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Notification

All rights reserved. No part of this Study material be reproduced in any form without permission in writing from Netaji Subhas Open University.

Kishore Sengupta
Registrar

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Subject: Honours in Sociology (ESO)

Bachelor Degree Programme (BDP)

Course : Paper - I (Introducing Sociology)

Module-1 : Sociology and Society

একক 1	❒	সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি, সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা	9-21
একক 2	❒	সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা, সমাজতত্ত্ব ও সমসাময়িক জীবন, সমাজতত্ত্ব ও সাধারণবোধ	22-26
একক 3	❒	সমাজের প্রকারভেদ : সনাতন আধুনিক ও উত্তর আধুনিক	27-30
একক 4	❒	সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি	31-40

পর্যায় 1 □ সমাজতত্ত্ব ও সমাজ

গঠন

উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

একক 1 সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি, সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

একক 2 সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা, সমাজতত্ত্ব ও সমসাময়িক জীবন, সমাজতত্ত্ব ও সাধারণবোধ

একক 3 সমাজের প্রকারভেদ : সনাতন আধুনিক ও উত্তর আধুনিক

একক 4 সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি

উপসংহার

অনুশীলনী

গ্রন্থপঞ্জী

উদ্দেশ্য

প্রথম পর্যায় পাঠ করলে আপনি—

- সমাজতত্ত্ব বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- সমাজত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কি তা বুঝতে পারবেন।
- সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা যায় কিনা সে সম্পর্কে ধারণা তৈরী করতে পারবেন।
- সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার ধারণার সঙ্গে পরিচিত হবে না।
- সমসাময়িক জীবনকে সমাজতত্ত্ব কিভাবে দেখে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- সাধারণ বোধের থেকে সমাজতত্ত্বের পার্থক্য কোথায় তা বুঝতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার সমাজ সম্পর্কে ধারণা তৈরী করতে পারবেন।
- সমাজতত্ত্বের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন।

প্রস্তাবনা

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে নবীনতম হল সমাজতত্ত্ব। এই পর্যায়ে প্রথমেই স্বতন্ত্র সমাজবিজ্ঞান

হিসেবে সমাজতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য এবং এর আলোচনার সীমানা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যায় কিনা সেসম্পর্কেও বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সমাজতত্ত্ব সমাজকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবে— সমাজতাত্ত্বিক সাধারন আমজনতা থেকে কিভাবে পৃথকভাবে সমাজকে ব্যাখ্যা করবে তা বুঝতে সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার আলোচনা প্রাসঙ্গিক ভাবেই উঠে এসেছে।

সমাজতত্ত্ব মূলতঃ আধুনিক সমাজের আলোচনা করে থাকে। কাজেই সমসাময়িক সামাজিক বিষয়গুলি ব্যাখ্যায় সমাজতত্ত্বের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে এই পর্যায়ে। আবার আধুনিক বা উত্তর আধুনিক সমাজের পাশাপাশি সনাতন অন্যান্য সমাজের বৈশিষ্ট্যও আলোচিত হয়েছে।

সমাজতত্ত্বের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক ও পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

একক 1 □ সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি, সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা

সমাজ ভিন্ন মানবজীবন অকল্পনীয়। কোন ব্যক্তিই নির্জন দ্বীপে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে পারে না। মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে পরস্পরের সাহচর্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। যুথবদ্ধতার প্রবণতা থেকেই মানুষ গড়ে তুলেছে পরিবার ও সমাজ। গোষ্ঠীবদ্ধতার পাশাপাশি মানুষ গড়ে তুলেছে নানা ধরণের সামাজিক নীতি, ধর্ম, আদর্শ, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, রীতিনীতি, প্রথা প্রভৃতি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইনব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা। সমাজে বিভিন্ন প্রকার স্বার্থ সংঘাত, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সত্ত্বেও মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করে। প্রকৃতপক্ষে, সমাজে মানুষ বিভিন্ন সম্বন্ধ জালে জড়িত হয়ে বসবাস করে এবং পরস্পরিক আন্তঃক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে। পরিবারে অভ্যন্তরে, পরিবারের বাইরে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক সমাজে এক সম্পর্কের জাল তৈরী করে। যখন কোন ভোটপ্রার্থী ভোটদাতার কাছে ভোট প্রার্থনা করতে যান তখন তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। আবার ক্রেতা যখন বিক্রেতার নিকট দরকষাকষি করে জিনিসপত্র ক্রয় করেন তখন তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্কটি হল অর্থনৈতিক সম্পর্ক। আবার জিনিসপত্র ক্রয় করার পর যখন তাঁরা পরস্পরের কুশল বিনিময় করেন অর্থাৎ শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে আন্তঃক্রিয়া করেন তখন সেই সম্পর্ক সামাজিক বলে চিহ্নিত করা যায়। সমাজতত্ত্ব সমাজের এই সম্পর্কজাল, বিশেষতঃ সামাজিক সম্পর্কসমূহ ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠির সঙ্গে গোষ্ঠির বা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কসমূহ নিয়ে আলোচনা করে।

মানব সমাজ ও সামাজিক আচরণ সমূহের বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূচনা করেন ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁত। (1789–1857) কোঁত সর্বপ্রথম (1839) Sociology শব্দটির উল্লেখ করেন। Sociology শব্দটি মূলতঃ ল্যাটিন শব্দ Socius, যার অর্থ সহযোগী বা সঙ্গী এবং গ্রীক Logos, যার অর্থ আলাপ আলোচনা,— এর সহযোগে গঠিত হয়েছে। সুতরাং Sociology বা সমাজতত্ত্ব হল এমন একটি শাস্ত্র যা সহযোগী বা সঙ্গী সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায় সমাজতত্ত্ব সহযোগীসমূহ বা মানবগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া এবং পরিণতি স্বরূপ গড়ে ওঠা সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক সমাজতত্ত্বকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কিন্তু কোন একটি সংজ্ঞাই সমাজতত্ত্বকে সন্তোষজনকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যতসংখ্যক সমাজতাত্ত্বিক প্রায় ততগুলিই সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞাও বিদ্যমান। সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলিকে আমরা মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

1. সমাজের অধ্যয়ন হিসেবে সমাজতত্ত্ব;

2. সামাজিক গোষ্ঠীর অধ্যয়ন হিসেবে সমাজতত্ত্ব;

3. সামাজিক ক্রিয়া, মিথষ্ক্রিয়া বা সামাজিক সম্পর্কের অধ্যয়ন হিসেবে সমাজতত্ত্ব;

4. সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যয়ন হিসেবে সমাজতত্ত্ব;

5. সামাজিক বন্ধন, সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক জীবন, সামাজিক বিষয়সমূহ প্রভৃতির অধ্যয়ন হিসেবে সমাজতত্ত্ব।

এখন এসম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা যাক।

1. সমাজের অধ্যয়ন হিসেবে সমাজতত্ত্ব ঃ

যে সকল চিন্তাবিদ এই মতবাদের প্রবক্তা তাঁরা বলেন যে সমাজতত্ত্ব কোন একটি অংশের নয়, সমগ্রে অধ্যয়ন। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহ যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কিভাবে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয় তা উদ্ঘাটন করা সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য। গিডিংস, ওয়ার্ড, ওডাম, লুন্ডবার্গ, ডেভিস, হর্টন এবং হান্ট প্রমুখ সমাজতত্ত্বে সমাজের অধ্যয়ন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন—

(i) জি. এ. লুন্ডবার্গের (1939) এর মতে সমাজতত্ত্ব হল "সমাজ সম্পর্কীত একটি বিজ্ঞান"।

(ii) এইচ. ডব্লু ওডাম (1947) মনে করেন "সমাজতত্ত্ব হল এমন একটি বিজ্ঞান যা সমাজকে অধ্যয়ন করে।"

(iii) হর্টন এবং হান্ট-এর মতে "সমাজতত্ত্ব সমাজকে বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়ন করে।"

2. সামাজিক গোষ্ঠীর অধ্যয়ন হিসেবে সমাজতত্ত্ব ঃ

এইচ. এম. জনসন, কিম্বল ইয়ং এর ন্যায় কয়েকজন চিন্তাবিদ সমাজতত্ত্বকে সামাজিক গোষ্ঠীর অধ্যয়ন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। যেমন—

(i) এইচ. এম. জনসন (1960) মনে করেন "সমাজতত্ত্ব এমন একটি বিজ্ঞান যা সামাজিক গোষ্ঠী, তাদের সংগঠনের আভ্যন্তরিন রূপ বা পদ্ধতি, যে প্রক্রিয়াসমূহ সংগঠনের এই রূপকে রক্ষণাবেক্ষণ করে অথবা পরিবর্তন ঘটায় এবং গোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কে আলোচনা করে।"

(iii) কিম্বল ইয়ং (1942) বলেন, "সমাজতত্ত্ব গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।"

3. সামাজিক ক্রিয়া, মিথষ্ক্রিয়া অথবা সামাজিক সম্পর্কের অধ্যয়ন হিসেবে সমাজতত্ত্ব ঃ

প্রাচীন জার্মান চিন্তাবিদগণ যেমন ম্যাক্স হ্বেবার, লিওপোল্ড ভন ওয়াইজ এবং জর্জ সিমেল মনে করেন সমাজতত্ত্বের উচিত কেবল সামাজিক ক্রিয়া, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বা সামাজিক সম্পর্কে অধ্যয়ন করা। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে ট্যালকট পারসনসও (1951) এই মতকে সমর্থন করেন। এইরূপ কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(i) ম্যাক্স হেবারের (1949) মতে "সমাজতত্ত্ব এমন একটি বিজ্ঞান যা সামাজিক ক্রিয়ার interpretive understanding করে থাকে।"

(ii) ম্যাকা ইভার ও পেজ (1949) এর মতে সমাজতত্ত্ব সামাজিক সম্পর্কের তন্তুজালের অধ্যয়ন; সম্পর্কের এই তন্তজালকেই সমাজ বলা হয়।

(iii) গোল্ডনার এবং গোল্ডনার (1963) বলেন, সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া।

4. **সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যয়ন হিসেবে সমাজতত্ত্ব ঃ**

কোন কোন চিন্তাবিদ মনে করেন সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের একক সমগ্র সমাজ নয়, বরং যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (পরিবার, চার্চ, বিদ্যালয় প্রভৃতি) সমাজ গঠন করে, তাদের মধ্যেকার সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক। এই বক্তব্যের মূল প্রবক্তা এমিল ডুর্খাইম (1901) বলেছেন যে সমাজতত্ত্বকে "প্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

5. **সামাজিক বন্ধন, সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক জীবন, সামাজিক বিষয় সমূহ প্রভৃতির অধ্যয়ন হিসেবে সমাজতত্ত্ব ঃ**

কিছু চিন্তাবিদ সমাজতত্ত্বকে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করেন। যেমন—

(i) অগবার্ন এবং নিমকফ (1964)-এর মতে "সমাজতত্ত্ব মানুষের সামাজিক জীবন সম্পর্কে অধ্যয়ন করে"।

(ii) রুটার (Reuter) এবং হার্ট (1933) মনে করেন "সমাজতত্ত্ব হল সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের অধ্যয়ন"।

(iii) উইনবার্গ এবং সাবাড (Shabat 1956)-এর মতানুযায়ী— "সমাজতত্ত্ব হল সমাজের মূল কাঠামোর অধ্যয়ন"।

(iv) বেনেট এবং টিউমিন (1946) এর মতে "সমাজতত্ত্ব হল সামাজিক জীবনের কাঠামো এবং কার্যাবলীর বিজ্ঞান"।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তবে সংজ্ঞাগুলিতে সমাজতত্ত্বের মূল বিষয় হিসেবে মানুষ, তার সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজই গুরুত্ব পেয়েছে।

সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি (Nature of Sociology)

জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে সমাজতত্ত্বের বিশেষ প্রকৃতি বিদ্যমান। অন্যান্য বিজ্ঞানের থেকে বিভিন্ন দিক থেকে এর পার্থক্য রয়েছে। রবার্ট বারস্টেড (Robert Berstedt) তাঁর **"The social Order"** গ্রন্থে সমাজতত্ত্বের নিম্নলিখিত মূল বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছেন—

(1) সমাজতত্ত্ব একটি স্বাধীন বিজ্ঞান ঃ

সমাজতত্ত্ব একটি স্বাধীন বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠেছে। এটি দর্শন বা ইতিহাসের ন্যায় অপর কোন বিজ্ঞানের শাখা নয়। স্বাধীন বিজ্ঞান হিসেবে এর অধ্যায়নের নিজস্ব ক্ষেত্র, সীমানা এবং পদ্ধতি বর্তমান।

(2) সমাজতত্ত্ব একটি সামাজিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয় ঃ

সমাজতত্ত্ব সামাজিক বিজ্ঞানের পরিবারভুক্ত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরিবারভুক্ত নয়। সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজতত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ, তার সামাজিক আচরণ, সামাজিক কার্যকালাপ, এবং সামাজিক জীবন। সমাজ বিজ্ঞান হিসেবে সমাজতত্ত্বের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান যেমন ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। অপরপক্ষে সামাজিক বিশ্ব নিয়ে আলোচনা করে বলে সমাজতত্ত্বের সঙ্গে পদার্থবিদ্যার রসায়ন, ভূবিদ্যা অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে বিশেষ পার্থক্য বর্তমান।

(3) সমাজতত্ত্ব একটি নিরপেক্ষ বিষয় (categorical), নীতিশাস্ত্রীয় (Normative) বিষয় নয় ঃ

সমাজতত্ত্ব কোনো বিষয় 'কি'—এই প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, 'কি হওয়া উচিত'—এর আলোচনা করে না। বিজ্ঞান হিসেবে সমাজতত্ত্ব মূল্যের প্রশ্নে নীরব থাকে। কোন প্রকার মূল্য বিচার সমাজতত্ত্ব করে না। নৈতিক অনৈতিক বিচার করে না। এটি নীতিনিরপেক্ষ। সামাজিক নীতি, আইন বা কার্যক্রম সম্পর্কেও কোন সুপারিশ করে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় সমাজতত্ত্বের জ্ঞান অকার্যকর নিষ্ফল, এর অর্থ হল সমাজতত্ত্ব ভাল-মন্দ, ঠিক-ভুল, নৈতিক-অনৈতিক-এর আলোচনা করে না, নিরপেক্ষভাবে সামাজিক বিষয়সমূহের আলোচনা করে।

(4) সমাজতত্ত্ব একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞান নয়—

আমরা প্রায়শঃ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করে থাকি। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের লক্ষ্য কেবল জ্ঞান আহরণ করা অর্জিত জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বা আদৌ ব্যবহার করা যাবে কিনা তা নিয়ে চিন্তা নয়। অপরদিকে ফলিত বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল আহরিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। প্রতিটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের একটি নিজস্ব ফলিত, বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থাকতে পারে, যেমন পদার্থবিদ্যা একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান--- কারিগরি বিদ্যা বা ইঞ্জিনিয়ারিং হল এর প্রয়োগমূলক ক্ষেত্র। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ফলিত বা প্রয়োগমূলক ক্ষেত্র বর্তমান, যেমন— বাণিজ্য, রাজনীতি, সাংবাদিকতা প্রভৃতি। সমাজতত্ত্ব একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, কারণ এর মূল লক্ষ্য হল মানব সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা— আহরিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করা নয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের প্রয়োগমূলক ক্ষেত্র হল Social work, প্রশাসন প্রভৃতি। সমাজতত্ত্ব কখনো public policy নির্ধারণ করেনা। আইন প্রণয়নকারীদেরও কোন সুপারিশ করেনা। তবে প্রশাসক, আইনপ্রণয়নকরী শিক্ষক, সামাজিক কর্মী (Social worker) বা নাগরিক বৃন্দ সমাজতত্ত্বের আহরিত জ্ঞান নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে।

(5) সমাজতত্ত্ব তুলনামূলকভাবে একটি বিমূর্ত (abstract) বিজ্ঞান মূর্ত (concrete) বিজ্ঞান নয়—

সমাজতত্ত্ব সমাজে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার বাস্তব মূর্ত রূপ নিয়ে আলোচনা করে না। বরং সমাজের

বিভিন্ন ঘটনার সামগ্রিক রূপ (form) এবং ধরণ (Pattern) নিয়ে আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ সমাজতত্ত্ব কোন বিশেষ যুদ্ধ বা বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করে না। বরং সাধারণভাবে সামাজিক বিষয় হিসেবে বা সামাজিক দ্বন্দ্বের ধরন হিসেবে যুদ্ধ এবং বিপ্লবের সম্পর্কে আলোচনা করে। একইভাবে সমাজতত্ত্ব কোনো বিশেষ সমাজ বা সামাজিক সংগঠনের অথবা বিশেষ কোনা বিবাহ, ধর্ম বা গোষ্ঠীর মধ্যে তার অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং সাধারণভাবে সমাজ, সংগঠন, বিবাহ, ধর্ম বা গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করে।

(6) সমাজতত্ত্ব একটি সাধারণ সূত্র নিমাণকারী (generalising) বিজ্ঞান—

সমাজতত্ত্ব মানুষের মিথষ্ক্রিয়া, সংঘ সম্পর্কে সাধারণ সূত্র বা নীতি সমূহ উদ্ঘাটন করার প্রয়াস করে। মানব গোষ্ঠী ও সমাজের প্রকৃতি, রূপ, **content** এবং কাঠামো বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করে। সমাজতত্ত্ব সমাজে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করে না বা বাস্তবে সম্ভবও নয়। সমাজতত্ত্ব কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণীকরণ করে। উদাহরণস্বরূপ সমাজতত্ত্ব বাস্তবের কয়েকটি গৌন গোষ্ঠীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সাধারণভাবে গৌন গোষ্ঠীর প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণীকরণ করে থাকে।

(7) সমাজতত্ত্ব একটি সাধারণ বিজ্ঞান, বিশেষ বিজ্ঞান নয়—

সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র সাধারণ, বিশেষীকৃত (Specialised) নয়। এটি সাধারণভাবে মানুষের মিথষ্ক্রিয়া এবং মানবজীবন সম্পর্কে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানও মানুষ ও মানুষের মিথষ্ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। তবে মানুষের সবরকম মিথষ্ক্রিয়া সম্পর্কে নয়। এইসকল সমাজবিজ্ঞান মানুষের মিথষ্ক্রিয়ার বিশেষ একটি দিকের ওপর জোর দেয় এবং সেই দিকটি নিয়েই বিশেষীকৃত আলোচনা করে। অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে বিশেষীকৃত আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু সমাজতত্ত্ব মানবজীবনের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, ধর্মীয়, আইনগত, নৈতিক ইত্যাদি কোন বিশেষ দিকের অনুসন্ধান করে না। বরং সামগ্রিক ভাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপের অধ্যয়ন করে।

(8) সমাজতত্ত্ব যুক্তিবাদী (Rational) এবং প্রত্যক্ষবাদী (Empirical) বিজ্ঞান—

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের দুটি মূল পদ্ধতি হল যুক্তিবাদী পদ্ধতি এবং প্রত্যক্ষবাদী পদ্ধতি। যুক্তিবাদী পদ্ধতি যুক্তিপূর্ণভাবে সিদ্ধান্তে পৌছনোর তত্ত্বসমূহের ওপর জোর দেয়। অপরদিকে প্রত্যক্ষবাদী পদ্ধতি অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রত্যক্ষবাদী তথ্য সংগ্রহ করে এবং যুক্তিবাদী সেই তথ্যের সমন্বয় সাধন করে ও সজ্জিত করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যথাযথ তথ্যের অভাবে যে কোন তত্ত্বই গুরুত্ব হারায়, কেবল মতামত বলে গণ্য হয়। আবার তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন তথ্যও অর্থহীন ও গুরুত্বহীন।

কাজেই জ্ঞান নির্মাণের জন্য সকল আধুনিক বিজ্ঞানই যুক্তিবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করে— সমাজতত্ত্ব এর ব্যতিক্রম নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে সমাজতত্ত্ব একটি স্বাধীন, সামাজিক, নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ, বিমূর্ত, সাধারণীকৃত, যুক্তিবাদী এবং প্রত্যক্ষবাদী এবং সাধারণ সমাজ বিজ্ঞান।

সমাজতত্ত্বের পরিধি (Scope of Sociology)

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই অধ্যয়ন ও গবেষণার একটি নিজস্ব পরিধি থাকে। সুনির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারিত না থাকলে কোন বিজ্ঞানেই যথাযথ অধ্যয়ন সম্ভব হয় না। কিন্তু সমাজতত্ত্বের পরিধি নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে দুটি মূল মতবাদ দেখা যায়— (ক) বিশ্লেষণাত্মক মতবাদ (Specialistic or formalistic school) এবং (খ) সংশ্লেষাত্মক মতবাদ (Synthetic school)।

(ক) **বিশ্লেষণাত্মক মতবাদ** (Specialistic or formalistic school) ঃ

এই মতবাদের সমর্থকদের মতে সমগ্র সমাজজীবনের সবরকম সামাজিক সম্পর্ক সমাজতত্ত্বের বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়। বরং সমাজজীবনের বিশেষ কিছু দিক বেছে নিয়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তার বিশ্লেষণ করাই সমাজতত্ত্বের উচিত। বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের প্রধান প্রবক্তাগণ হলেন ফার্ডিনেন্ড টনিজ (ferdinand Tonnies) জর্জ সিমেল (Georg Simmel), আলফ্রেড ভিয়ারকানড (Alfred Vierkandt), লিওপোল্ড ভন ওয়াইজ (Leopold von wiese)।

সমাজস্থ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন কারণে নানারকম পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। বিশ্লেষণাত্মক মতবাদী সিমেলের মতে এই সকল সামাজিক আন্তক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন শ্রেণি বা type-এ বিভক্ত করা সমাজতত্ত্বের বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। তিনি এই সকল আন্তঃক্রিয়ার বাহ্য রূপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে সামাজিক আন্তঃক্রিয়াসমূহ যে বিভিন্ন রূপ বা ফর্ম (form) গ্রহণ করে সেই সব রূপ বা form-কে পৃথক পৃথক শ্রেণি বা type হিসেবে ভাগ করা যেতে পারে। সিমেল মনে করেন বিভিন্ন সামাজিক আন্তঃক্রিয়া বা সম্পর্কের অন্তস্থ বিষয়বস্তু বা Content থেকে তার বিমূর্ত রূপ বা form-কে পৃথক করে তার আলোচনা করা উচিত। একটি গ্লাসে দুধ, মধু, জল বা অন্য যেকোন তরল রাখা হতে পারে, কিন্তু এতে গ্লাসের আকৃতির পরিবর্তন হয় না। উদাহরণস্বরূপ তিনি আধিপত্য ও অধীনতা প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা, শ্রমবিভাগ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। পরিবারে বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যেকার আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্কের প্রকৃতি আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আধিপত্য অধীনতার সম্পর্কের প্রকৃতি এক নয় কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্কের কাঠামো একরূপ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা এবং বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য, কিন্তু প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার বাহ্যরূপটি এক। কাজেই সিমেল মনে করেন সমাজতত্ত্ববিদের কাজ হল বিভিন্ন প্রকার সামাজিক আন্তঃক্রিয়া ও সামাজিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন শ্রেণি বা form অনুযায়ী বিভক্ত করা।

আলফ্রেড ভিয়ারকাণ্ড আরও সঙ্কীর্ণভাবে সমাজতত্ত্বের পরিধি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে সামাজিক জীবনের মৌলিক মানসিক বৃত্তিসমূহ যেগুলি মানুষের বিভিন্ন আন্তঃক্রিয়াকে প্রভাবিত

করে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। যেমন— পছন্দ করা বা না করা, বাধ্য থাকা বা অবাধ্য হওয়া, মান্য করা বা অমান্য করা ইত্যাদি। তিনি মনে করেন কোন সমাজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সমাজতত্ত্বের আলোচনার বিষয় নয়। সমাজতত্ত্বে ভারতীয় সমাজ বা জাপানী সমাজ অধ্যয়নের লক্ষ্য হল ঐ সকল সমাজস্থ মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক কোন কোন মানসিক বৃত্তির ওপর নির্ভরশীল অথবা ঐ সকল সমাজের গতিপ্রকৃতি কি ধরণের মানসিকতার ওপর নির্ভর করে তাই সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়বস্তু। যেমন— ইংরেজ সমাজের ভিত্তি হল ইংরেজদের রক্ষণশীলতা বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানী সমাজের পুনরভ্যুত্থানের পশ্চাতে রয়েছে এই সমাজের কর্তব্যনিষ্ঠতা, কর্মকুশলতা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি।

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক আচরণ গভীরভাবে উপলব্ধি করা ও ব্যাখ্যা করাই সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়বস্তু। তবে সামাজিক আচরণ বলতে তিনি সমস্ত ধরনের মানুষের সম্পর্কে ক্ষেত্রকে বোঝাতে চাননি। তিনি আরও মনে করেন সমাজতত্ত্বের উচিত বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কের শ্রেণিবিন্যাস ও বিশ্লেষণ করা।

ভন্ ওয়াইজ মনে করেন মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের দুটি মূল ধারা বিদ্যমান— সংযোগকারী (associative) এবং বিয়োগকারী (dissociative)। অভিযোজন (accommodation), আত্তীকরণ (assimilation), সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রভৃতি সংযোগকারী ধারার উদাহরণ। অপরদিকে দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, বিরুদ্ধাচারণ করা প্রভৃতি হল বিয়োগকারী ধারার উদাহরণ। ওয়াইজ অবশ্য মনে করেন সংযোগকারী ও বিনিয়োগকারী ধারর সংমিশ্রণে তৃতীয় একটি ধারাও দেখা যেতে পারে।

সুতরাং দো যাচ্ছে বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের মুখ্য প্রবক্তাগণের সামাজিক সম্পর্কের কোন কোন্ বিশেষ দিক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের সকলেরই মূল বক্তব্য হল সমগ্র সমাজজীবনের পরিবর্তে সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ বিশেষ দিক আলোচনার মধ্যেই সমাজতত্ত্বের পরিধি সীমিত থাকা উচিত। তাঁদের মত অনুযায়ী সমাজতত্ত্ব হবে একটি বিশুদ্ধ, বিশেষীকৃত শাস্ত্র যার বিষয়বস্তু অন্য কোন সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সাথে জড়িয়ে না পড়ে এবং সমাজতত্ত্বের স্বকীয়তা বজায় থাকে। সমাজতত্ত্বের পরিধি হিসেবে বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের বিভিন্ন সমালোচনা হয়ে থাকে।

প্রথমতঃ, সমাজ একটি অখন্ড বিষয়। এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, এবং একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই সমাজের বিশেষ অংশকে খণ্ডিত রূপে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। এই কারণে Alex Inkeles মনে করেন সমাজতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ অংশের পরিবর্তে সমগ্র সমাজকেই আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্লেষণাত্মক সমাজতত্ত্ব সামাজিক সম্পর্ক ও আন্তক্রিয়াসমূহের Content বা অন্তঃস্থ বিষয়কে উপেক্ষা করে বাহ্যরূপে বা form এর আলোচনা যথাযথ হয় না। এ প্রসঙ্গে সোরোকিনের বক্তব্য হল একটি গ্লাস ওয়াইন, জল বা মধু দিয়ে পূর্ণ করলে গ্লাসের আকৃতি বা রূপ পরিবর্তন হয় না

ঠিকই কিন্তু এমন কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবা যায় না, যার সদস্যবৃন্দ পরিবর্তিত হলে প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিবর্তিত হবে না।

তৃতীয়তঃ প্রকৃত সামাজিক প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে শুধু বিমূর্ত সামাজিক বিষয় আলোচনা নিরর্থক। যেমন সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতাকে বিমূর্ত ধারণারূপে আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে যখন সিমেল নিজেই বলছেন শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতা ধারণা দুটি আকৃতি প্রকৃতিতে পৃথক হয়।

চতুর্থতঃ, বিশুদ্ধ শাস্ত্র হিসেবে সমাজতত্ত্বকে গড়ে তোলা কখনই সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে কোন বিজ্ঞানকেই অপরাপর বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করা যায় না। এই কারণে বর্তমানে আন্তবিষয়ক (interdisciplinary) আলোচনা অধিক গুরুত্ব পায়।

বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের প্রবক্তাগণ সমাজতত্ত্বকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও বিশ্লেষণাত্মক সমাজতত্ত্বের একটি বিশেষ অবদান হল সামাজিক সম্পর্কসমূহকে কতকগুলি প্রকার বা type-এ বিভক্ত করা। এর ফলে সমাজের অজস্র সামাজিক সম্পর্ক বোঝা ও বিশ্লেষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

(খ) **সংশ্লেষাত্মক মতবাদ** (Synthetic School) ঃ

সংশ্লেষত্মক মতবাদের প্রবক্তাগণ সমাজতত্ত্বকে বিশুদ্ধ শাস্ত্রের পরিবর্তে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের সংশ্লেষ এবং সাধারণ সমাজবিজ্ঞান হিসেবে বর্ণনা করেন।

এই মতবাদের মূল বক্তব্য হল সমাজের বিভিন্ন অংশ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। কাজেই কোন একটি সামাজিক বিষয় বা ঘটনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে একটি দিকের আলোচনা যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান সমাজের ভিন্ন ভিন্ন দিক বিশেষ ভাবে আলোচনা করে। যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং অর্থনীতি সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। ইতিহাস সমাজের অতীত সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে। যেহেতু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন দিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যা ঘটে তার প্রভাব সমাজের অন্যান্য দিকেও পড়ে। কাজেই সামগ্রিক ভাবে সমাজকে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। অনেকেই মনে করেন সমাজতত্ত্বের উচিত সংশ্লেষাত্মক আলোচনা করে সমাজের সামগ্রিক রূপকে বিশ্লেষণ করা।

এমিল ডুর্কহেইম, লিওনার্ড হব হাউস, মরিস জিনসবার্গ এবং পিটিরিম সোরোকিন সংশ্লেষাত্মক মতবাদের মুখ্য প্রবক্তা।

ডুর্কহেইম সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তুকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—(১) সামাজিক অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (Social Morphology), (২) সামাজিক শরীরবিদ্যা (Social Physiology) এবং (৩) সাধারণ সমাজতত্ত্ব (General Sociology)। সামাজিক অঙ্গসংস্থানবিদ্যা সমাজের ভৌগোলিক অবস্থান, লোকসংখ্যার ঘনত্ব, এবং অন্যান্য পরিবেশগত প্রভাবের প্রকৃতি, ব্যাপকতা ও গভীরতা নিয়ে আলোচনা করে। শরীরবিদ্যার যেমন শরীরের

বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়, সামাজিক শরীরবিদ্যাও সমাজের বিভিন্ন আচার ব্যবস্থার প্রকৃতি ও উৎস পৃথক পৃথক ভাবে বিশদে বিশ্লেষণ করে। আবার এই সকল আচার ব্যবস্থার মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সাধারণ সমাজতত্ত্বের কাজ।

ডুর্কহেইমের মতে এইরূপ সংশ্লেষাত্মক আলোচনার মাধ্যমে সমাজের অখণ্ড রূপটি উন্মোচিত হবে এবং সামাজিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করাও সম্ভব হবে যা সমাজকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে সহায়ক হবে।

সংশ্লেষাত্মক মতবাদের অপর একজন প্রবক্তা জিনসবার্গ সমাজতত্ত্বের মূল উপজীব্য বিষয়সমূহকে চারভাগে ভাগ করেছেন— (১) সামাজিক অঙ্গসংস্থান বিদ্যা (Social Morphology), (২) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social control) (৩) সামাজিক প্রক্রিয়া (Social processes) এবং সামাজিক রোগনিরূপণ বিদ্যা (Social Pathology)।

(১) সামাজিক অঙ্গসংস্থান বিদ্যা ঃ সামাজিক অঙ্গসংস্থানবিদ্যা জনসংখ্যার গুণগত এবং পরিমাণগত দিক নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া সামাজিক কাঠামো, সামাজিক গোষ্ঠী, এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকেল অধ্যয়ন করে।

(২) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঃ 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ'— সমাজের বিধিবদ্ধ (formal) এবং অবিধিবদ্ধ (informal) দুই প্রকার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেই আলোচনা করে, যেমন— প্রথা, ঐতিহ্য, নীতি, ধর্ম, প্রভৃতির সঙ্গে আইন, আদালত প্রভৃতিরও আলোচনা করে।

(৩) সামাজিক প্রক্রিয়া ঃ সমাজের বিভিন্ন প্রকার আন্তঃক্রিয়া, যেমন সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, উপযোজন, আত্তীকরণ, বিচ্ছিন্নকরণ, ঐক্য, উন্নয়ন, অবনমন প্রভৃতি সম্পর্ক আলোচনা করে 'সামাজিক প্রক্রিয়া'।

(৪) সামাজিক রোগনিরূপণবিদ্যা ঃ 'সামাজিক রোগনিরূপণবিদ্যাত সমাজের বিভিন্ন সামঞ্জস্যহীনতা (maladjustment) এবং বিভিন্ন প্রকার উপদ্রব বা গোলমাল (disturbances) সম্পর্কে আলোচনা করে। এটি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, বেকারত্ব, জন-বিস্ফোরণ, গণিকাবৃত্তি, অপরাধ প্রভৃতিকেও বিশ্লেষণ করে।

জিনস্‌বার্গ সমাজতত্ত্বের মুখ্য কার্যগুলি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন—

(i) সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সম্পর্কসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করার প্রয়াস করে।

(ii) সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করে। যেমন— অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নীতিগত ও আইনগত প্রভৃতি।

(iii) সামাজিক পরিবর্তন ও স্থায়ীত্বের মূল কারণগুলি উন্মোচিত করা এবং সমাজজীবনের সমাজতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রকগুলি আবিষ্কার করা। এছাড়াও সমাজতত্ত্ব গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে সমাজের সম্ভাব্য পরিবর্তনের ইঙ্গিতও দেয়।

সমাজতন্ত্র সামাজিক সমস্যাদির প্রতিকারের বিকল্প পন্থাসমূহ বিশ্লেষণ করে। সমাজতত্ত্ব নীতি নির্ধারণ না করলেও নিরপেক্ষ গবেষণার মাধ্যমে নীতি নির্ধারককে সুনির্দিষ্ট পথের ইঙ্গিত দেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজতত্ত্বের আলোচনার পরিধি ব্যাপক। সমাজের সকল সামাজিক দিক যেমন সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক রোগ নিরূপণবিদ্যা প্রভৃতি নিয়েই সমাজতত্ত্ব আলোচনা করে।

সমাজতত্ত্বে সামাজজীবনের কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের বিমূর্ত আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও যেমন রয়েছে তেমনি সমাজের সামগ্রিক আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই বলা যায় সমাজত্ত্বের পরিধি সংক্রান্ত দুটি মতবাদ বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষাত্মক মতবাদ দুটি পরস্পরের পরিপূরক, সমাজতত্ত্বের আলোচনায় উভয়ের গুরুত্বই অনস্বীকার্য।

সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা (Scientific Status of Sociology)

সাধারণভাবে বিজ্ঞান বলতে আমরা পদার্থবিদ্যা রসায়ন, জীববিদ্যা ইত্যাদি বিষয়কেই বুঝিয়ে থাকি। সাধারণ মানুষ সমাজজীবন সম্পর্কিত অধ্যয়নকে বিজ্ঞান বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞান কোন বিশেষ অধ্যয়নের বিষয়কে বোঝায় না, বিজ্ঞান হল বিশেষ জ্ঞান। আরও বিস্তৃত করে বললে বিজ্ঞান হল যে কোন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও পদ্ধতিগত ভাবে অর্জিত সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান। মার্টিনডেলের (Martindale) মতে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে কোন বিষয়বস্তুর সঙ্গে নয়।

এখন দেখা যাক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রকৃতি কিরূপ এবং সমাজতত্ত্বে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য কিনা, অর্থাৎ সমাজতত্ত্বকে আদৌ বিজ্ঞান বলা যায় কি না।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্টসমূহ ঃ

(i) যাচাই যোগ্যতা (Verifiabiality) ঃ

পর্যবেক্ষিত ঘটনাসমূহ যাচাইযোগ্য হওয়া উচিত। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একই বিষয়ে বিভিন্ন গবেষকের গবেষণায় যদি বারংবার একই ফলাফল পাওয়া যায় তবে সেই পদ্ধতিটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হবে।

(ii) সঠিক বাস্তবতা (Accuracy) ঃ

বাস্তবকে সঠিকভাবে উপস্থাপনা করাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ কোন ঘটনাকে অতিরিঞ্জিত করে বা যুক্তিহীনভাবে সিদ্ধান্তে না পৌঁছে প্রকৃত বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাই এই পদ্ধতিতে করা হয়।

(iii) যথার্থতা (Precision) ঃ

যথার্থ সংখ্যা বা পরিমাপ উল্লেখ করা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। যেমন— "আমি অনেকের

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি"— এর পরিবর্তে "আমি 450 জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি"— এরূপ বক্তব্য যথার্থতা উপস্থাপন করে।

(iv) **নিয়মতান্ত্রিকতা (Systematization) ঃ**

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে এবং সংগঠিত উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যাতে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়।

(v) **বিষয়গততা (Objectivity) ঃ**

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিষয়গততা। গবেষক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে থাকেন।

(vi) **অভিজ্ঞতা নির্ভর (Empirical) ঃ**

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা নির্ভর হয়ে থাকে। অনুমানের ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান গড়ে ওঠে না।

(vii) **তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (Related to theory) ঃ**

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে এবং নতুন তত্ত্বের জন্ম দেয় বা বর্তমান তত্ত্বের পুনর্গঠন করে।

(viii) **সাধারণীকরণ (Generalization) ঃ**

নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক ঘটনাকে শ্রেণিবদ্ধ করে তা থেকে সাধাণসূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

(ix) **মূল্যমান নিরপেক্ষতা (Value free) ঃ**

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষক কোন বিষয়, ঘটনা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ভাল না মন্দ অর্থাৎ তার মূল বিচার করে না। কেবল প্রকৃত অবস্থার ব্যাখ্যা করে।

(x) **ভবিষ্যদ্বানী করতে সক্ষম (Predictability) ঃ**

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্তমান বিষয় ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে ভবিষ্যতে ঐ বিষয়ে কি ঘটতে পার তার ভবিষ্যদ্বানী করতে সক্ষম হয়।

এখন দেখা যাক, সমাজতত্ত্বে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় কি না এবং সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যায় কি না।

প্রকৃতপক্ষে, সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তুর কেন্দ্রস্থল রয়েছে মানুষ ও মানুষের সৃষ্ট সমাজ। মানুষের স্বাধীন সত্ত্বা রয়েছে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মত সে প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন নয়, বরং মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রভাবিত করে তার বশে আনার চেষ্টা করে। ফলে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যেরূপ নিখুঁত সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা সম্ভব সমাজতত্ত্বে তথা সমাজবিজ্ঞানে তা সম্ভব হয় না। এছাড়া সমাজতত্ত্বে গবেষক নিজে সমাজের একটি অংশ, কাজেই তার পক্ষে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু গবেষণাগারে পর্যবেক্ষণ করা যায় না— গোটা সমাজই এখানে গবেষণাগার। ফলে নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট রূপ পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় না। আবার সমাজের বিভিন্ন মানুষের আচরণ ও ঘটনাবলীর বিভিন্নতার কারণে যথাযথ সাধারণীকরণ করাও অনেক সময় সম্ভব হয় না।

কিন্তু এইসকল বিরুদ্ধ মতামতের পাশাপাশি সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মর্যাদার পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি বিদ্যমান। নিম্নে এগুলি আলোচনা করা হল—

(i) সাধারণভাবে মানুষের মধ্যেও বহু ব্যাপারে একই আচরণের প্রবণতা দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ— পৃথিবীর বিভিন্ন মানবজাতির মধ্যে সামাজিক সংগঠনগুলির মৌলিক সাদৃশ্য, পরিবার ব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস, শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বজিনীনতা ইত্যাদি। এই সকল সর্বজনীন বিষয়কে সমাজবিজ্ঞানী স্বাভাবিকভাবেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষর করতে পারেন।

(ii) সমাজতত্ত্বে সংখ্যাবাচক তথ্য থেকে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যায়। জীবনযাত্রার মান নির্ণয়, বেকার সমস্যা, দারিদ্রতার সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণিত বা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির সাহায্যে অনেকটাই নিভুলভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়।

(iii) বার্বারা উটন (Barbara Woot) এর মতে বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানে বিভিন্ন গবেষণার ভবিষ্যদ্বানীও করা হচ্ছে যার পদ্ধতি দ্রুত উন্নত হচ্ছে এবং উৎসাহব্যাঞ্জক ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে।

(iv) গবেষণার ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যেমন— পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental method) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical method), তুলনামূলক পদ্ধতি (comparative method) কার্যনির্বাহী (Functional method) প্রভৃতি মাধ্যমে সমাজতত্ত্ব বিমূর্ত ও বাস্তব ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ করে।

(v) প্রশ্নমালা, প্রশ্নতালিকা, সাক্ষাৎকার, একক সমীক্ষা ইত্যাদি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সমাজতাত্ত্বিক সামাজিক ঘটনাবলীর নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

(vi) সমাজতত্ত্বে গবেষক কোন বিষয়ের ওপর মূল্যমান আরোপ করেন না—বাস্তব বিষকে ব্যাখ্যা করাই সমাজতত্ত্বের লক্ষ্য। যেমন—যৌথ পরিবার একক পরিবারের তুলনায় ভাল বা আত্মহত্যা বন্ধ হওয়া উচিত ইত্যাদি ব্যক্তিগত মতামতের কোন স্থান সমাজতত্ত্বে নেই।

(vii) সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ সূত্র অনুসন্ধান করে— যেমন শিশু অপরাধের কারণ, দুর্নীতির কারণ ইত্যাদি।

(viii) বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সাধারণীকরণও সমাজতত্ত্বে করা সম্ভব হয়, যা থেকে সাধারণ সূত্র (General rules) নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে সমাজতত্ত্বকে তার পদ্ধতিগতর প্রয়োগের ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া অসঙ্গত নয়। তবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের ন্যায় সামাজিক মানুষ সর্বদা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে না। ফলে সমাজতত্ত্বে সম্পূর্ণ নির্ভুল সাধারণ সূত্র নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। কাজেই বলা যেতে সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানের সমগোত্রীয় বিজ্ঞান পদবাচ্য নয়; সমাজতত্ত্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়—সামাজিক বিজ্ঞান।

একক 2 □ সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা, সমাজতত্ত্ব ও সমসাময়িক জীবন, সমাজতত্ত্ব ও সাধারণবোধ

সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা (Sociological Imagination)

আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক সি. রাইট মিলস (C. Wright Mills) 1959-এ সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা (Sociological Imagination)-এর ধারণাটির উল্লেখ করেন। Sociological Imagination এর ধারণাটি সমাজতত্ত্ব সমাজ সম্পর্কে কি প্রকার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে তার বর্ণনা করে। সি. রাইট মিলস সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা বলতে বুঝিয়েছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সম্পর্ক সম্পর্কে সচেতনতাকে। সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা কোন তত্ত্ব নয়। এটি সমাজ সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা ব্যক্তির প্রতিদিনের সাধারণ জীবনের উর্ধে নতুনভাবে জীবনকে দেখতে শেখায়। সুতরাং সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন কেবলমাত্র সাধারণ নিয়মে জ্ঞান আহরণ নয়। সমাজতাত্ত্বিককে ব্যক্তিগত পরিস্থিতির বেড়া ভেঙে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বিষয়সমূহকে ব্যাখ্যা করতে শিখতে হয়। এছাড়াও সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা কেবলমাত্র সমাজ জীবনের বর্তমান রূপকেই বিশ্লেষণ করে না। কিছু সম্ভাব্য ভবিষ্যতের রূপকেও উপস্থাপিত করে। অবশ্য এজন্য বর্তমান প্রবণতাসমূহ সম্পর্কে সামাজতাত্ত্বিক উপলব্ধি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। বলা যেতে পারে সমাজতত্ত্ব বৃহত্তর বিশ্বের সামাজিক ক্রিয়াকর্ম— যেগুলির সঙ্গে আমরা সকলেই সংযুক্ত রয়েছি সেগুলি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করার একটি শক্তিশালী উপায়।

সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন করার সক্ষমতা। সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা করতে হলে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। আমাদের দৈনিক জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শেখায়। ব্যক্তিগত পরিস্থিতির গণ্ডি থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিভিন্ন বিষয়সমূহকে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে দেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মিলস্ মনে করেন সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা ব্যক্তিগত সমস্যাকে জনগণের সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়।

দৈনিক জীবনে সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা প্রতিদিনকার বিভিন্ন ঘটনা বা ক্রিয়াকর্মকে দেখে থাকি, সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা তা থেকে ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একটি দৈনিক বিষয় কফি পান করাকে আপাতদৃষ্টিতে একটি অত্যন্ত সাধারণ আচরণ বলে মনে হয়। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এই আপাত সাধারণ বিষয়টি সম্পর্কে প্রভূত আলোচনা সম্ভব।

প্রথমতঃ কফি কেবলমাত্র শারিরীক তৃষ্ণা মেটানোর জন্য পান করা হয়, তা নয়। দৈনন্দিন সামাজিক ক্রিয়ার সঙ্গে কফি পানের এক বিশেষ প্রতীকী মূল্য জড়িয়ে রয়েছে। বেশীরভাগ সময়েই কফি পানের চেয়ে এর সঙ্গে জড়িত সামাজিক রীতির গুরুত্ব অনেক বেশি। পাশ্চাত্যের সমাজের মানুষের কাছে

সকালে এক কাপ কফি ব্যক্তিগত দৈনন্দিন রুটিনের বিশেষ অঙ্গ। এটি দিন শুরু করার এক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এরপর দিনের অন্যান্য সময়ে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে একসঙ্গে কফি পান করা হতে পারে— বা সামাজিক রীতির অঙ্গ। দুজন ব্যক্তি যখন কফি পান করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় তখন কফি পানের চেয়ে দুজনে একত্রিত হয়ে গল্পগুজব করাতেই বেশি উৎসাহী থাকে। প্রকৃতপক্ষে সব সমাজেই পানাহারের বিষয়টি সামাজিক আদানপ্রদান ও সামাজিক রীতি পালনের ভিত্তি হয়ে থাকে। এবং স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়গুলি সমাজতত্ত্বের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু।

দ্বিতীয়তঃ, কফিতে রয়েছে ক্যাফেইন নামক ড্রাগ যা মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে। অনেকেই সারাদিনের কাজ, পড়াশোনার মাঝে শরীর মন সতেজ করতে কফি পান করে থাকে। যদিও কফি পান অভ্যাস বা নেশায় পরিণত হয়ে যায়, পাশ্চাত্য সমাজে কফির নেশাগ্রস্তকে ড্রাগ সেবনকারী বলে মনে করা হয় না। এই সমাজে এ্যালকোহলের ন্যায় কফি ও সামাজিকভাবে গৃহীত ড্রাগ বিশেষ হয়। কিন্তু মারিজুয়ানা সামাজিকভাবে গৃহীত হয় না। আবার এমন কোন কোন সমাজ আছে যেখানে মারিজুয়ানা বা এমনকি কোকেইনের মত ড্রাগ সেবন করাকেও স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু কফি এবং অ্যালকোহল সেবন করাকে স্বীকৃতি দেয় না। সমাজতত্ত্ব এরূপ বিপরীতধর্মী আচরণের কারণ উদ্ঘাটন করতে আগ্রহী হয়।

তৃতীয়তঃ, একজন কফি পানকারী বিশ্বজুড়ে এক জটিল আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে কফি উৎপাদিত হয় দরিদ্র দেশসমূহে এবং তা অধিক পরিমাণে পান করা হয় ধনী দেশসমূহে। কাজেই কফির উৎপাদন, সরবরাহ এবং বণ্টনের মাধ্যমে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী দেশের মানুষের মধ্যে নিরন্তর আদান প্রদান সংঘটিত হয়। এইপ্রকার বিশ্বজুড়ে আদানপ্রদান সমাজতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থতঃ, কফি পানের বিষয়টি অতীত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতির ইঙ্গিতবাহী। পাশ্চাত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কফি জনপ্রিয় পানীয় হয়ে ওঠে যদিও এর পূর্বে এলিট সম্প্রদায়ের মধ্যে কফি পানের প্রবণতা দেখা যেত। কফির উদ্ভব হয় মধ্য প্রাচ্যে কিন্তু দুই শতাব্দী পূর্বে পাশ্চাত্যের উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কফির জনপ্রিয়তার সূচনা হয়। বর্তমানে আমরা যে কফি পান করি তার বেশিরভাগ আসে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা থেকে। যেখানে ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। কাজেই কফির বিশ্ব বাণিজ্য গড়ে ওঠার পেছনে ঔপনিবেশিকতার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে।

পঞ্চমতঃ, বর্তমানে বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মানবাধিকার এবং পরিবেশের অবক্ষয়ের সম্পর্কিত বিভিন্ন বিতর্কে কফি একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে রয়েছে। মানুষ কি ধরণের কফি পান করবে এবং তা কোথা থেকে ক্রয় করবে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে তার জীবনধারার অন্তর্গত হয়ে উঠেছে কোন কোন ব্যক্তি কেবল জৈব কফি পছন্দ করতে পারেন। ক্যাফেইন বিহীন কফি পছন্দ করতে পারেন কেউ কেউ। আবার কেউ এমন কফি পছন্দ করেন, যার ন্যায্যভাবে বাণিজ্য হয়ে থাকে। (যেখানে উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদনকারীকে পূর্ণ বাজার মূল্য প্রদান করা হয়)। অনেকে আবার সেইসব দেশের কফি বয়কট করতে পারেন যে দেশ মানবাধিকার ও পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়ে কিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন

প্রান্তের ঘটমান বিষয় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে এবং মানুষ কিভাবে সেই জ্ঞান অনুযায়ী কার্য করে সমাজ তাত্ত্বিকরা তা নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হন।

সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা আমাদের এটা বুঝতে সাহায্য করে যে অনেক বিষয় আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত বিষয় বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি বৃহত্তর বিষয়ের অঙ্গ। উদাহরণস্বরূপ বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি যখন বিবাহবিচ্ছেদ করেন, তাঁকে খুব কঠিন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়— মিলের ভাষায় যা একটি ব্যক্তিগত সমস্যা। কিন্তু তিনি মনে করেন বিবাহ বিচ্ছেদ একই সঙ্গে বর্তমানে অনেক সমাজে যেমন ব্রিটেনে একটি গণ সমস্যা। যেখানে দশ বছরের মধ্যে প্রতি তিনটির মধ্যে একটি বিবাহ ভেঙে যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিজের জীবনেও প্রয়োগ করা যায় এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর সমাজে তার অবস্থানের প্রতিচ্ছবি।

সমাজতত্ত্ব ও সাধারণ বোধ (Sociology and Common Sense) ঃ

দৈনন্দিন বাস্তব জীবন সম্পর্কে জ্ঞান থেকেই সাধারণ বোধ গড়ে ওঠে। সাধারণ ব্যক্তি তার চারপাশের জগতকে যে অপেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে তাকে সাধারণ বোধ বলা যেতে পারে। সাধারণবোধ সম্ভূত জ্ঞান বাস্তবসম্মত, পরীক্ষামূলক এবং সমালোচনা মূলক হলেও একই সঙ্গে এই জ্ঞান খণ্ডিত, অসামঞ্জস্যমূলক এবং বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ পদ্ধতির প্রয়োগবিহীন। অপরদিকে সমাজতত্ত্ব সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের কার্যকারণ (causality) সম্পর্ক বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দেয়।

অবশ্য আন্দ্রে বেতের মতে সমাজতত্ত্ব সাধারণবোধের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন ধারণা, পদ্ধতি ও তথ্য দ্বারা গঠিত। অত্যন্ত উচ্চ মানের তথ্য সমৃদ্ধ সাধারণবোধ ও নিম্নমাত্রায় সংগঠিত সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের সমকক্ষ হতে পারে না। সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান বিশ্বজনীন না হলেও সাধারণ (General) হয়ে থাকে, অপর দিকে সাধারণ বোধ সুনির্দিষ্ট ও স্থানীয় স্তরে গঠিত। সাধারণবোধ পরিবর্তনশীল স্থান-কাল ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়াদির সাপেক্ষে সাধারণবোধ পরিবর্তিত হয়।

সমাজতত্ত্বের সূচনাকালেই সাধারণ বোধ-এর বিপরীত মেরুতে এর অবস্থান নির্মিত হয়েছে। অগাস্ট কোঁত এবং এমিল ডুর্কহেইম-এর দৃষ্টবাদের দর্শনেই তার প্রতিফলন ঘটে যেখানে তাঁরা বলেন যে সমাজতত্ত্বে সামাজিক বাস্তবতাকে অনুধাবন করা উচিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে। কাজেই এই দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় সাধারণ বোধের ভূমিকা গুরুত্বহীন।

অবশ্য আন্দ্রে বেতে মনে করেন সমাজতত্ত্ব সাধারণ বোধ থেকে পৃথক। এর অর্থ এই নয় যে সমাজতত্ত্ব মানুষের সাধারণবোধের বাইরে কোন গুপ্ত রহস্য বিদ্যা। পরিবর্তীকালে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বেতের এই বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে সমাজ হল বিভিন্ন অর্থের ক্ষেত্র বিশেষ। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা নির্ভর পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ ও সামাজিক বস্তুসত্যই সমাজ অধ্যরণে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুতরাং

সমাজতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সামাজিক জগত সম্পর্কে মানুষের ধারণা, যা সাধারণ বোধ সম্ভূত জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপলব্ধি করা।

মাক্স ওয়েবার, উইল হেম ডিলদি প্রমুখ interpretive সমাজতাত্ত্বিক জর্জ হার্বার্ট মিড এবং চার্লস কুলী প্রমুখ প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়াবাদী Ethnomethodologist হ্যারল্ড গারফিনকেল প্রমুখ তাদের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাধারণবোধ সম্ভূত জ্ঞান ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু সাধারণ বোধ সম্ভূত জ্ঞানের সাহায্যে সমাজ বিশ্লেষণের পদ্ধতি অসচেতন সমাজতাত্ত্বিকের জন্য ভ্রান্তিকর হতে পারে। বেতে মনে করেন, সাধারণবোধ বা পেশাগত দক্ষতা দুটির কোনটিকেই বাদ দিয়ে যথাযথ আলোচনা সম্ভব নয়।

সাধারণ বোধের সাহায্যে আমরা সমাজ সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা যথাযথ হয় না। যেমন 'মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে মানুষের অপরাধ প্রবণতা কমে' এরূপ সাধারণবোধ সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এন্থনি গিডেনস্ মনে করেন সাধারণ মানুষ নিজের জীবনের নিরিখে বিশ্বকে বিশ্লেষণ করে থাকে। ফলে সাধারণবোধ দ্বারা অনেক অজানা বিষয়কে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে না। ফলে এই পদ্ধতিতে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। যেমন বহু আদিবাদী গোষ্ঠীর বিভিন্ন সামাজিক রীতি সম্পর্কে অবহিত না থাকায় আদিবাসী মানুষের কাছে সেগুলি বিস্ময়কর, অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ সমাজে সামাজিক পরিস্থিতি অনুসারে সামাজিক রীতি নীতি গড়ে ওঠে যা সেই সমাজের প্রেক্ষিতেই বিশ্লেষণ করা উচিত, যা সাধারণ বোধ সম্ভূত জ্ঞান দ্বারা সম্ভব হয় না।

সমাজতত্ত্ব এবং সমকালীন জীবন (Sociology and contemporary life) ঃ

সমকালীন সমাজ বলতে আধুনি সমাজ বর্তমান সময়ের বিশেষ সামাজিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজকে বোঝায়। সামগ্রিকভাবে এই সময়ের, সমকালীন, সমাজের বৈশিষ্ট্য হল প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা, বিভিন্ন নতুন নতুন আবিষ্কার, মানুষের গড় আয়ের বৃদ্ধি, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, অধিক মাত্রায় লিঙ্গ সাম্য। প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে বিশ্বায়নের মাত্রা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

সমকালীন সময়ের আধুনিক জটিল সমাজকে বিশ্লেষণ করতে সমাজতত্ত্বের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আধুনিক সময়ে সামাজিক বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ সমাজতত্ত্বের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের উন্নয়ন (Human welfare) ত্বরান্বিত করার মাধ্যম হিসেবেও সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষতঃ অনুন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। দ্রারিদ্র্য, বেকারত্ব, গণিকাবৃত্তি, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা, জাতিগোষ্ঠীগত (racial) সমস্যা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, যুব অসন্তোষ, মাদকাসক্তি, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সমকালীন সমাজে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজতত্ত্ব এইসকল সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের পথ নিরূপণ করে থাকে।

সমাজের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণেও সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজ সংস্কার এবং সমাজ পুনর্নির্মাণেও সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্যণীয়।

আধুনিক শিল্প সমাজের জীবন যাত্রার আমূল পরিবর্তন সমাজতত্ত্বের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সমকালীন সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব সমূহ ও আধুনিকতা ও উত্তরআধুনিক সমাজের বিভিন্ন দিককে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করে।

একক 3 □ সমাজের প্রকারভেদ : সনাতন আধুনিক ও উত্তর আধুনিক

সমাজের প্রকারভেদ (Types of Society)

অনেক সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন মানব সমাজ উন্নয়নের কয়েকটি বৃহৎ পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে। এই অধ্যায়ে আমরা সনাতন বা প্রাক আধুনিক (traditional/premodern) আধুনিক (modern) এবং উত্তর আধুনিক (post modern) সমাজের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করব।

সনাতন/প্রাক আধুনিক সমাজ (Traditional/ Premodern Societies ঃ

সনাতন সমাজেরও বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। অ্যান্থনি গিডেনস সনাতন সমাজের তিনটি মূল প্রকারভেদের আলোচনা করেছেন—

(i) শিকার ও সংগ্রহমূলক সমাজ (hunting and gathering society), (ii) পশুপালন ও কৃষিসমাজ (Pastoral and agrarian society) এবং (iii) শিল্পবিহীন সভ্যতা (Non-industrial civilization).

(i) **শিকার ও সংগ্রহমূলক সমাজ (hunting and gathering society) ঃ** পৃথিবীর আদিমতম সমাজের মানুষ ফলমূলক, শাকসবজি সংগ্রহ করে বা পশুশিকার করে জীবন ধারণ করত। সাধারণত এই প্রকার সমাজ পঞ্চাশ জনেরও কম সংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত আদিবাসী গোষ্ঠী। এই প্রকার সমাজে ধনদৌলত ও বস্তু সম্পদের অস্তিত্ব ছিল নগণ্য। সামান্য যা কিছু সম্পদ থাকত তা সবই অংশীদারমূলক। শিকার ও সংগ্রহমূলক সমাজে সামাজিক অসাম্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অবশ্য এইপ্রকার সমাজে বয়স্ক ব্যক্তিদের মর্যাদা ও প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। বর্তমানে এই সমাজের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। গিডেনস্-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যার ০.০০০১ শতাংশ মানুষ শিকার ও সংগ্রহমূলক সমাজের সদস্য। আফ্রিকা, নিউ গিনি, ব্রাজিলের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে।

(ii) **পশুপালন ও কৃষিসমাজ (Pastoral and agrarian Societies) ঃ** গিডেনস মনে করেন প্রায় 20,000 বছর পূর্বে পশুপালন সমাজের উদ্ভব হয়েছে। পশুপালন সমাজের সদস্যরা পশুপালনের পাশাপাশি কখনও কখনও খাদ্য শিকার ও সংগ্রহ করত। গরু, উট, ঘোড়া প্রভৃতি পশু পালন করা হত। পশুদের থেকে দুধ যেমন পাওয়া যেত যানবাহন হিসেবেও পশুদের ব্যবহার করা হত। পশুপালন সমাজে ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ সম্ভব ছিল— পশু আহরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিরা সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারত। ফলস্বরূপ এই সমাজে সামাজিক অসাম্যও শিকার ও সংগ্রহমূলক সমাজের তুলনায় অধিক ছিল। পশুদের চারণভূমির সন্ধান এই সমাজের সদস্যদের মূলত; এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করতে হয়। কাজেই পশুপালন সমাজ মূলতঃ যাযাবর প্রকৃতির হয়ে থাকে। ফলে এই সমাজ অন্যান্য সমাজের সংস্পর্শে আসত। এই সমাজের সদস্য সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি— কখনও তা আড়াই লাখ পর্যন্তও হত। মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার অনেক অংশে এখনও কিছু পশুপালক সমাজের অস্তিত্ব দেখা যায়।

কৃষি সমাজে মানুষ মূলতঃ শস্য উৎপাদন করে জীবন ধারণা করে। শিকার ও সংগ্রহমূলক সমাজের তুলনায় পশুপালন সমাজও কৃষি সমাজে নির্ভরযোগ্য ও সুনিশ্চিত খাদ্যের উৎস মজুত থাকায় অধিক সংখ্যক সদস্যের ভরণ-পোষণ সম্ভব হয়ে থাকে।

কৃষিসমাজ যাযাবর প্রকৃতির নয়। খাদ্যশস্য মজুত করে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করার প্রবণতাও কৃষিসমাজে লক্ষ্য করা যায়। ফলস্বরূপ এই সমাজে যথেষ্ট অসাম্য বিদমান। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলের জীবিকা নির্বাহের মূল পদ্ধতিই হল কৃষি। 1990 সালে নেপাল ও রাওয়ান্ডীর 90% শতাংশের বেশি জনসংখ্যা, উগান্ডার 80% শতাংশের বেশি জনসংখ্যা, বাংলাদেশের 70% শতাংশের বেশি জনসংখ্যা কৃষিকার্যে নিযুক্ত। অবশ্য সমকালীন কৃষি সমাজগুলিতে সনাতন সমাজের বৈশিষ্ট্য হ্রাস পাচ্ছে এবং আধুনিক শিল্প সমাজের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

(iii) শিল্পবিহীন সভ্যতা (Non-industrial civilization) ঃ খৃস্টপূর্ব 6000-এ প্রথম শিল্পবিহীন সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। অ্যান্থনি গিডেনস-এর মতে এই সভ্যতার বিকাশের মূলে রয়েছে শহরের উদ্ভব। এই প্রকার সভ্যতায় ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অসাম্য অত্যধিক এবং এই সভ্যতার রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল রাজতন্ত্র।

শিকার ও সংগ্রমূলক সমাজ বা পশুপালন ও কৃষিসমাজের আদি পর্বের তুলনায় শিল্পবিহীন সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা দেখা যেত। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট বিকাশ লক্ষণীয়। এই সভ্যতার অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল লিপির উদ্ভব। এই ধরণের অনেক সভ্যতাই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল এবং নিজস্ব সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার মায়া ও ইনকা সভ্যতা, ইওরোপের প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা এবং এশিয়া মহাদেশে ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সকল সভ্যতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সশস্ত্র সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। তবে সভ্যতার কোনটিই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং বর্তমানে এদের কোনটিরই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই শিল্প বিহীন সভ্যতা মানব সমাজের বিকাশের ওপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করেনি, বা আধুনিক শিল্প সমাজের দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

আধুনিক সমাজ (Modern Societies) ঃ শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে পরিবর্তনের ফলে যে সমাজ গড়ে ওঠে আধুনিক সমাজ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। Lee এবং Newby-র মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে উত্তর ইওরোপ এবং উত্তর আমেরিকার সমাজের এক ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটছিল। তাঁদের এই রূপান্তরের মূল ভিত্তিগুলি হল শিল্প (industrialism), পুঁজিবাদ (capitalism), নগর (urbanism), উদার গণতন্ত্রবাদ (liberal democracy)। এই সকল রূপান্তরের ফলেই আধুনিক সমাজের উদ্ভব ঘটে।

(i) শিল্প (Industrialism) ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিল্প বিপ্লপের সূচনার ফলে প্রথমে ব্রিটেনের সমাজে এবং পরে অন্যান্য সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রূপান্তরের সূত্রপাত ঘটে— কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্প উৎপাদনমূলক অর্থনীতিতে রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কারের ফলে উৎপাদনশীলতা লক্ষ্যনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। শ্রম বিভাজনের চরম বিকাশ ঘটে— মানুষ অধিক পরিমাণে

বিশেষীকৃত (specialised) কাজে নিযুক্ত হয়। মানুষের জীবন ঋতুপরিবর্তন বা দিন রাত্রির ছন্দের পরিবর্তে ঘড়ির কাঁটার সাথে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

(ii) **পুঁজিবাদ (Capitalism)** ঃ শিল্প ব্যবস্থার (Industrialism)-এর বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে পুঁজিবাদ (Capitalism)-এর বিকাশ। পুঁজিবাদ হল লাভের উদ্দেশ্যে শ্রম নিয়োজন এবং ব্যবসা সংগঠিত করা। পুঁজিবাদের বিকাশের পূর্বে বহু কৃষক নিজেদের জমি চাষাদ করে উৎপাদিত ফসলের সাহায্যে জীবন ধারণ করত। ক্রমে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষক তার জমি হারাল এবং কৃষি শ্রমিক বা নবগঠিত শিল্প কারখানার শ্রমিকে পরিণত হল। নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটল— পুঁজিবাদী ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত শিল্পপতি শ্রেণি ও শিল্প কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণি।

(iii) **নগরবাদ (Urbanism)** ঃ শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার সাথে সাথে বিশাল সংখ্যক মানুষ গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের পূর্বে 1750 সালে ব্রিটেনের মাত্র দুটি শহরে লন্ডন ও এডিনারাতে জনসংখ্যা 50,000 এর বেশি ছিল। 1851 সালে ব্রিটেনের 29টি শহরে জনসংখ্যা 50,000-এর বেশি হতে দেখা গেল। নগরায়নের ফলে শহরের উদ্ভবের ফলস্বরূপ নানারকম সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি হল, যেমন— অপরাধ, দাঙ্গা, এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি প্রভৃতি। নবগঠিত শহরগুলির সামাজিক গঠন সনাতন গ্রাম সমাজ থেকে পৃথক। অনেকেই মনে করেন গ্রাম সমাজের ন্যায় সম্প্রদায় চেতনা শহরে অনুপস্থিত। অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি (যেমন পরনিন্দা, পরচর্চা) গ্রামীন সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও নগর জীবনে বিশেষ কার্যকরী হয় না।

(iv) **উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal democracy)** ঃ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনের পূর্বে রাজা বা রাণী রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁদের শাসনের অধিকার ছিল প্রশ্নাতীত। রাজা বা রাণী ভগবানের প্রতিনিধি হিসেবে পরিগণিত হতেন। কিন্তু 1981 ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফরাসী রাজতন্ত্র, 1775-83-এর আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে আমেরিকায় ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির নাগরিকত্বের অধিকারের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক দল এবং সমাজ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হয়েছে। পূর্বের রাজার একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে সমাজ কেমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত তা নিয়েই বিতর্কের পরিসর গড়ে উঠেছে।

উপরোক্ত পরিবর্তন সমূহকে আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। সুতরাং উন্নত শিল্প এবং প্রযুক্তি, নগরায়ণ বৃহৎ জনসংখ্যা, আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত অনুযায়ী সামাজিক স্তরবিন্যাস ও জটিল প্রকৃতির শ্রম বিভাজন অসংখ্য কাজের সুযোগ, টেলিফোন, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, রান্নার গ্যাস, বিদ্যুৎ, জল নিষ্কাষণ ব্যবস্থা, রেলওয়ে, বিমানবন্দর, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির ন্যায় পৌর সুবিধা সমূহ সামাজিক সচলতা আবেগের পরিবর্তে যুক্তিপূর্ণ চিন্তার উদ্ভব প্রভৃতির সাথে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি এ সবই আধুনিক সমাজের (Modern society) বৈশিষ্ট্য।

উত্তর আধুনিক সমাজ (Post modern Society) ঃ কিছু সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন সাম্প্রতিকালে

পাশ্চাত্যের সমাজে এমন কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে যা পূর্বের আধুনিকতার ধারণার সঙ্গে মেলে না। তাঁরা মনে করেন এই সমাজকে উত্তর আধুনিক সমাজ বলা চলে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 80-র দশক বা 90-র দশকের শুরুতে আধুনিকতার অবসান ও উত্তর আধুনিকতার সূচনা ঘটে। উত্তর আধুনিকতা মূলতঃ বৃহৎ তত্ত্বসমূহ (grand narratives), আদর্শ এবং যুক্তিবাদের ওপর এবং চরম সত্যের অস্তিত্বের ওপর অনাস্থা পোষণকারী দৃষ্টিভঙ্গি। উত্তর আধুনিকতাবাদ যুক্তিবাদিতার ধারণা, মানব প্রকৃতি ও সমাজের প্রগতির আধুনিক ধারণাকেও বর্জন করে। বরং উত্তর আধুনিকতাবাদ যুক্তিবাদিতার ধারণা, মানব প্রকৃতি ও সমাজের প্রগতির আধুনিক ধারণাকেও বর্জন করে। বরং উত্তর আধুনিকতাবাদ মনে করে জ্ঞান এবং সত্য নির্দিষ্ট সমাজের সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক মতবাদ থেকে উদ্ভূত হয়, ফলস্বরূপ এগুলি স্থান কাল অনুসারে গঠিত হয়।

উত্তর আধুনিক সমাজে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর আস্থা হারাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পরিবেশ দূষণের ধ্বংসাত্মক প্রভাব, পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিপদসমূহ সমপর্কে মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে। বৃহৎ যুক্তিবাদী (rational) আমলাতান্ত্রিক সংগঠনগুলি মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে না বলেই বহু মানুষের বিশ্বাস। পূর্বে যে রাজনৈতিক বিশ্বাস সমাজের উন্নতি করবে দাবী করত, তার ওপরও মানুষ আস্থা হারাচ্ছে। বিজ্ঞান (Science) ও যুক্তিবাদ (rationalism) থেকে সরে এসে অনেক মানুষ অযুক্তিবাদী (non-rational) বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে— বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের (Scientific rationalism) এর বিরোধী বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস গ্রহণ করছে।

কিছু উত্তর আধুনিকতাবাদী মনে করেন সমাজের এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক পরিবর্তন। শিল্প সমাজ রূপান্তরিত হচ্ছে শিল্পোত্তর সমাজে। পাশ্চাত্যের সমাজে খুব কম মানুষই উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। অধিকাংশ মানুষ যুক্ত রয়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রে সঙ্গে এবং বিশেষতঃ যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির কাজের সঙ্গে। কম্প্যুটার প্রযুক্তির গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদন শিল্পের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে এবং যোগাযোগের গতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনী পাশ্চাত্য সমাজে মানুষ তাদের আয়ের বেশীরভাগ অংশ ব্যয় করছে অবসর যাপনে। মানুষের জীবনে ও অর্থনীতিতে গণমাধ্যমের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপরোক্ত পরিবর্তনের অনেকগুলি নিঃসন্দেহে সংঘটিত হলেও কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন এই পরিবর্তন এতটা বৃহৎ আকারের বা তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে বলা যেতে পারে আধুনিক সমাজ উত্তর আধুনিক সমাজে পরিবর্তিত হয়েছে।

একক 4 □ সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি

সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান ঃ সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব (Sociology and Anthropology)

নৃতত্ত্ব বা Antropology-র মূল উপজীব্য হল নৃ অর্থাৎ মানুষ। (Anthropology) শব্দটি গ্রীক শব্দ Anthropos এবং Logos-এর সমাহারে সৃষ্টি হয়েছে। Anthropos শব্দটির অর্থ মানুষ এবং Logos শব্দটি অর্থ জ্ঞান। সুতরাং Anthropology-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল মানুষ সংক্রান্ত জ্ঞান। নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের পরিধি ব্যাপক। এই শাস্ত্র প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology) ভাষাতত্ত্ব (Linguistics), মানুষের শারীরিক গঠন ও আকৃতি সম্পর্কিত চর্চা (Physical Authropology), মানুষের জীবনধারা সম্পর্কিত আলোচনা (cultural or Social Authropology) প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

সমাজতত্ত্বের সঙ্গে নৃতত্ত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষত সামাজিক নৃতত্ত্বের (Cultural or Social Anthropology) সঙ্গে বিষয়গত দিক থেকে সমাজতত্ত্বের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। সামাজিক নৃতত্ত্ব প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম সমাজের সমগ্র জীনধারা মানব সমাজব্যবস্থা, পরিবার ব্যবস্থা, আচার অনুষ্ঠন, প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। সমাজতত্ত্বের ও মূল আলোচ্য বিষয় মানবসমাজ, পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভৃতি। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব, বিশেষতঃ সামাজিক নৃতত্ত্ব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। হোয়েবেল (Hoebel) এর মতে সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব বৃহত্তর অর্থে একই বিষয়।

সমাজতাত্ত্বিকরা বর্তমান সামাজিক বিষয়সমূহ উপলব্ধি করার জন্য সমাজের অতীত সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করে নৃতত্ত্ব থেকে। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিষয় যেমন পরিবারের উৎস, বিবাহের সূত্রপাত, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধর্মের উদ্ভব প্রভৃতি নৃতত্ত্বের আলোকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। অপরপক্ষে সমাজতত্ত্বের গবেষণালব্ধ সূত্রগুলি নৃতত্ত্বের আলোচনাকে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ নৃতত্ত্ববিদ মরগ্যান ও তাঁর অনুগামীরা আধুনিক সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা থেকেই আদিম সাম্যবাদের অস্তিত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

আপাতদৃষ্টিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মতে বিশেষ সাদৃশ্য ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলেও উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। বিষয়দুটির ধারণাসমূহ, গবেষণা পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ এবং আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ সমাজতত্ত্ব অপেক্ষাকৃত আধুনিক উন্নত ও সভ্য সমাজব্যবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে। অপরদিকে নৃতত্ত্বের আলোচনা অক্ষরপরিচয়হীন অপেক্ষাকৃত অপরিস্থিত ঐতিহাসিক নথি আদিম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজের বিশেষ কোন অংশ নিয়ে গবেষণা করেন। কারণ তাঁরা যে আধুনিক জনবহুল ও ভৌগোলিক দিক থেকে বৃহদায়তন সমাজব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেন সেই সমাজের সব দিক নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয় না। কাজেই সমাজের বিশেষ বিশেষ দিক যেমন পারিবারিক ব্যবস্থা, বিবাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। অপরদিকে আদিম মানুষ্যসমাজের আয়তন ক্ষুদ্র জনসংখ্যাও কম, তাই নৃতত্ত্ববিদগণ এই সমাজব্যবস্থার সমস্ত দিকই বিচার বিশ্লেষণ করেন ও সমগ্র সমাজের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা।

তৃতীয়তঃ, নৃতত্ত্ববিদরা মূলত; অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদরা বর্তমান সমাজ নিয়েই আলোচনা করে থাকেন।

চতুর্থতঃ, এই দুই শাস্ত্রের অনুশীলনপদ্ধতিও পৃথক। নৃতত্ত্ববিদ যে সমাজের ওপর গবেষণা করেন নিজে সেই সমাজের outsider বা বহির্বাসী হওয়ায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ঐ সমাজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষর করে থাকেন। আবার যেহেতু এই রূপ সমাজের অতীতের কোন নথির অস্তিত্ব নেই ও সমাজটি অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তনশীল, এই গবেষণায় ঐতিহাসি দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে নৃতত্ত্ববিদ আলোচ্য সমাজে বাস করে সমাজের লোকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার মাধ্যমে সেই সমাজের আচার ব্যবহার, মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা বা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করেন— অর্থাৎ অংশগ্রহণমূলক ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। নৃতত্ত্ববিদের এই গবেষণা পদ্ধতিকে clinical বা সাক্ষাৎ পরিচয়ভিত্তিক বলে অভিহিত করা হতে পারে। পক্ষান্তরে সমাজতত্ত্বে ঐতিহাসিক পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হয়। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সমাজতত্ত্বে কখনও কখনও ব্যবহার হলেও সমাজতত্ত্বের গবেষরা মূলতঃ প্রশ্নমালা ও পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভরশীল ও সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে নৃতত্ত্ববিদ সমাজকে ভেতর থেকে এবং সমাজতত্ত্ববিদ সমাজকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করেন।

অবশ্য বর্তমানে পশ্চিমী ধ্যানধারণা, প্রযুক্তি ইত্যাদির প্রভাবে অদিম জনগোষ্ঠীগুলিও পরিবর্তিত হচ্ছে— বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে। সমাজগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে এবং সমাজতত্ত্বের ন্যায় এক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজ পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আদিম সমাজ কেবল নৃতত্ত্বের গবেষণাধীন নয় আবার আধুনিক সমাজও কেবল সমাজতত্ত্বের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নেই। বর্তমানে আধুনিক সমাজের বিভিন্ন দিক যেমন— আত্মীয়গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জনসম্প্রদায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হচ্ছে। অবশ্য এতদ্সত্ত্বেও সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে ধারণাগত ও পদ্ধতিগত পার্থক্য বজায় রয়েছে।

সমকালীন সমাজের মধ্যে তৃতীয় এক প্রকার সমাজ দেখা যায় যা আদিম নয়, আবার উন্নত শিল্প সমাজও নয়। ভারতবর্ষের উল্লেখ করা যেতে পারে। এইরূপ সমাজের জাতি ব্যবস্থা, গ্রাম সমাজ, শিল্পায়নের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববিদগণ অভিন্ন ভাবে গবেষণা করে থাকেন। এই

প্রক্রিয়ায় সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যও ক্রমে ক্রমে আসে ও ভবিষ্যতে দুটি শাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্যের অবসান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব (Sociology and Psychology) ঃ

মনস্তত্ত্ব হল মানব আচরণসমূহের আলোচনা। F. H. Giddings-এর মতানুসারে মনস্তত্ত্ব হল মানুষের মন ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞান। সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এমিন ডুর্কহেইম মনে করেন সমাজতত্ত্বের উচিত সামাজিক ঘটনা বা Social facts নিয়ে আলোচনা করা, মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা বা psychological facts নিয়ে নয়। তাঁর মতে সামাজিক ঘটনা ব্যক্তির exterinal বা বহিঃস্থ বিষয় যা ব্যক্তির ওপর একটি বহির্চাপ বা external constraint সৃষ্টি করে।

যেমন 'আত্মহত্যা' ব্যক্তিবিশেষের কাজ। কিন্তু তিনি দেখেন যে বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতি ব্যক্তিকে আত্মহতা করতে প্ররোচনা দেয়। কাজেই সামাজিক ঘটনাকে সামাজিক কারণ দ্বারাই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে ভুল পথে চালিত করবে বলেই তিনি মনে করেন।

অপরদিকে জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, মানুষ যা কিছু করে তার পেছনে তার মন ক্রিয়াশীল থাকে। কাজেই মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক আন্তঃক্রিয়া উপলব্ধি করতে হলে তার মানসিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

অনেক সমাজতত্ত্ববিদের মতে সমাজতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব পরস্পরের পরিপূরক। ম্যাক্স ওয়েবার সহ বহু জার্মান সমাজতত্ত্ববিদের মতে যে সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াক সম্পূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব সেগুলিকেও আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব মনস্তত্ত্বের সাহায্যে।

প্রসঙ্গক্রমে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব পরস্পরের পরিপূরক হলেও উভয়ের স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্যনীয়। উভয় শাস্ত্রের আলোচনা ক্ষেত্র পৃথক। সমাজতত্ত্বের আলোচনার লক্ষ্য হল সামাজিক আন্তঃক্রিয়া ও সামাজিক সম্পর্ক, অপরদিকে মনস্তত্ত্বের আলোচনার লক্ষ্য সমাজের পরিবর্তে ব্যক্তি—ব্যক্তির মানসিক গতিপ্রকৃতি। মনস্তত্ত্ববিদগণ সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রকাশি চিন্তা তেনার গঠন-বিন্যাস ও আচরণের প্রকৃতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থাকেন। অপরদিকে সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ সামাজিক সম্পর্কসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন।

পরিশেষে একথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সামাজিক মনস্তত্ত্ব বা Social Psychology সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। সামাজিক মনস্তত্ত্বের মূল লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তি হলেও ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক মনস্তত্ত্ব সমাজে ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। সুতরাং এদিক থেকে সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সামাজিক মনস্তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস (Sociology and History) ঃ

সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ইতিহাস মানুষের অতীতের পুনর্গঠন। এই শাস্ত্র অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের জীবনের এবং কীর্তিসমূহের এক সুসংহত নথি। ঐতিহাসিক মূলত অতীতের ঘটনাসমুহ সম্পর্কে আগ্রহী হন। তবে কেবল ঘটনার বর্ণনা নয়, অতীত সম্পর্কে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কারণও অনুসন্ধান করেন। আবার অতীতের পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগাযোগ ও প্রদান করে। অপরদিকে সমাজতত্ত্ব একটি সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। যা বর্তমান নিয়ে আগ্রহী। মানুষের বিভিন্ন আন্তঃ ক্রিয়া ও পারস্পরিক সম্পর্কের বৈচিত্র্য ও জটিলতা বিশ্লেষণ করে সমাজতত্ত্ব। তবে সমাজতত্ত্ব সমাজের ঐতিহাসিক পরিবর্তনও অনুধাবন করে থাকে। এই শাস্ত্র মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়, জীবনযাত্রার ধরণ, প্রথা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সঙ্ঘ নিয়ে আলোচনা করে। সমাজতত্ত্বের এই প্রকার অনুধাবনে ইতিহাস তার তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্য সরবরাহ করে।

সুতরাং সমাজতত্ত্ব বর্তমান নিয়ে আগ্রহী হলেও, বর্তমানকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য তার অতীতকেও জানা প্রয়োজন হয়ে থাকে। মূলতঃ সমাজতত্ত্বে তুলনামূলক পদ্ধতিতে গবেষণার ক্ষেত্রে অনেকসময়ই ঐতিহাসিক তথ্যাদির ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়া সমাজতত্ত্বের একটি ধারা Historical sociology বা ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্বের আলোচনায় প্রয়োজনীয় তথ্য ইতিহাসই সরবরাহ করে।

ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে অনুধাবন করার ইতিহাসও সমাজতত্ত্বের মৌলিক ধারণাসমূহের ওপর নির্ভর করে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইতিহাস তার যে সকল প্রয়োজনীয় ধারণাসূত্র দর্শন থেকে গ্রহণ করত, বর্তমানে তার বেশির ভাগ সমাজতত্ত্ব থেকেই গৃহীত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সমাজতত্ত্ব অনুশীলনের একটি বিশেষ ধারা— ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ব বা Historical Sociology-র কথা। এই ধারায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনসমূহের উদ্ভব বিকাশ ও শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে ঐতিহাসিক ধারণার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ম্যাক্স ওয়েবারের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কিত আলোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

অপরদিকে Social History বা সামাজিক ইতিহাস-এর আলোচনার ক্ষেত্রও প্রায় একই। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ সমাজতত্ত্বের মৌলিক ধারণাসমূহের ভিত্তিতে শ্রেণি, সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের ইতিহাস আলোচনা করে। বর্তমানে বহু দেশেই সমাজতাত্ত্বিক এবং সামাজিক ঐতিহাসিকের (Social historians) পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বহু ক্ষেত্রে আলোচনার একই বিচরণক্ষেত্রও লক্ষ্য করা যায়।

সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের মধ্যে গভীর সম্পর্ক সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও বিদ্যমান।

প্রথমতঃ সমাজতত্ত্ব বর্তমান বা নিকট অতীতের সামাজিক ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ করে থাকে। অপরদিকে ইতিহাস মানব সমাজের অতীত ঘটনাসমূহের আলোচনা করে।

সমাজতত্ত্বের আলোচনা বা abstract বিমূর্ত, কিন্তু ইতিহাসের আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ বা Concrete উদাহরণস্বরূপ সমাজতত্ত্ব মানবসমাজের সকল যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা পৃথকভাবে আলোচনা করে না, বরং সামাজিক ঘটনা হিসেবে যুদ্ধকে বিশ্লেষণ করে। অপরপক্ষে ইতিহাস সুনির্দিষ্ট যুদ্ধের বিবরণ দেয়। ঐতিহাসিকের কাছে মানব সমাজের প্রতিটি যুদ্ধের ঘটনাই গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজতত্ত্ব মূলতঃ সাধারণীকরণের বিজ্ঞান (generalising science)। সামাজিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে সাধারণ সূত্র গঠন করা এর উদ্দেশ্য। অপরদিকে ইতিহাস সাধারণ সূত্র নির্মাণের পরিবর্তে নির্দিষ্ট ঘটনাসমূহের কালানুক্রমিক বিবরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন ঘটনার প্রভাব সমাজের মানুষের ওপর কিভাবে পড়ছে তা বিশ্লেষণ করে, কিন্তু ইতিহাস বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের কালানুক্রমিক বর্ণনা করে থাকে।

উপরোক্ত পার্থক্য সত্ত্বেও সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের নিকট সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। উভয়ের আলোচনাক্ষেত্রই সমাজে বসবাসকারী মানুষকে কেন্দ্র করে, কখনও এদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক আবার কখনও একই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে।

সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Sociology and Political Science) ঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজস্থ মানুষের রাজনৈতিক কার্যাবলী আলোচনা করে। উদ্ভব, বিবর্তন এবং কার্যাবলী, সরকারের ধরণ, সরকারের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক সংবিধানের প্রকার, প্রশাসন, আইন, অন্তর্দেশীয় সম্পর্ক, নির্বাচন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন, রাজনৈতিক আদর্শ প্রভৃতি বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্গত।

অপরপক্ষে সমাজতত্ত্ব মানুষের সমাজের সামগ্রিক আলোচনা করে থাকে। কাজেই সমাজতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্র অনেক বেশি ব্যাপক। সমাজের বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজতত্ত্বের অন্যতম বিশেষীকৃত শাখা বলা যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর সমাজতত্ত্বের প্রভাব রয়েছে। সমাজতত্ত্বের আবির্ভাবের সময়কাল থেকেই বিশেষতঃ মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রভাব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মার্ক্সীয় চিন্তাধারা মিশেল, ম্যাক্স ওয়েবার এবং প্যারেটোর রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বকে প্রভাবিত করে এবং ফলস্বরূপ রাজনৈতিক দল, এলিট, নির্বাচনী আচরণ, আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক আদর্শসমূহ সম্পর্কিত আধুনিক অধ্যয়নের সূচনা হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আচরণবাদ বা behaviourissm-এর প্রাধান্যও সমাজতত্ত্বের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি। কেবলমাত্র শাসনব্যবস্থার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে, মনোভাব এবং রাজনৈতি আচরণের ওপর আলোকপাত করে। সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব বা Political sociology নামে একটি নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে।

অপরদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানও সমাজতত্ত্বের উপাদান সরবরাহ করে। সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে রাষ্ট্রের সংগঠন, কার্যাবলী সংক্রান্ত জ্ঞানের সঙ্গে সমাজস্থ মানুষের রাজনৈতিক আচরণ, ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত তথ্যও সংগ্রহ করে।

সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যাপক গিডিংস মনে করেন, "To teach the theory of the state to man who have not learnt the first principles of sociology is like teaching astronomy or thermodynamics to men who have not learnt the Newtonian Laws of Motion". ("যারা সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক সূত্রগুলি শেখেনি তাদের রাষ্ট্রের তত্ত্ব শেখানো হল যার নিউটনীয় গতিসূত্রসমূহ শেকেনি তাদের জোতির্বিদ্যা বা রার্মোডায়নামিক্স শেখানোর মত বিষম ব্যাপার।) কোঁত এবং স্পেনসারের মত অনুযায়ী দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রায় কোন পার্থক্য নেই বললেই চলে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকলেও উভয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে।

প্রথমতঃ সমাজতত্ত্ব সমাজস্থ মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে থাকে, অর্থাৎ সমাজকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বে করা হয়। অপরদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কেবলমাত্র মানুষের রাজনৈতিক জীবন, রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। কাজেই সমাজতত্ত্বের পরিধি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনায় অনেক ব্যাপক।

সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ পৃথক। সমাজতত্ত্ব মানুষের সামাজিক দিকটি নিয়ে আলোচনা করে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাজকে বিশ্লেষণ করে। অপরদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে রাজনৈতিক জীব হিসেবে তার আচার আচরণ বিশ্লেষণ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকে সমাজের মুখ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে দেখে। কিন্তু সমাজতত্ত্বের কাছে রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ মাত্র।

সুতরাং সমাজত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও দুটি শাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।

সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি (Sociology and Economic) ঃ

অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শালের মতে অর্থনীতি একদিকে যেমন সম্পদ সম্পর্কিত আলোচনা, অপরদিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল এটি মানুষ সম্পর্কিত আলোচনা।

অর্থনীতি মানুষকে সম্পদ আহরণকারী ও আমানতকারী হিসেবে আলোচনা করে। সম্পদ আহরণ, সম্পদ সৃজন, সম্পদ বণ্টন ও সম্পদের ব্যবহার, সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় নির্ধারণ ও উপায়সমূহ প্রয়োগের কৌশল নিরূপণ করা নিয়ে অর্থনীতি গবেষণা করে থাকে।

বহুদিন পর্যন্ত অর্থনীতি অন্যান্য সমাজবিদ্যা থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখার চেষ্টা করেছে। সমাজের অন্যান্য দিক উপেক্ষা করে কেবলমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এর আলোচ্য বিষয় ছিল। এই প্রকার আলোচনায় অর্থনীতিবিদগণ দুটি বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। প্রথমতঃ মানুষ তার অর্থনৈতিক কাজকর্মসমূহ, যেমন কেনাবেচা, উৎপাদন, বণ্টন, সংগ্রহ প্রভৃতি সর্বাধিক লাভ বা উপযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পাদন করে থাকে এবং এ বিষয়ে সে অত্যন্ত যুক্তিসম্মত (rational) আচরণ করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ মানুষের যুক্তিসম্মত অর্থনৈতিক আচরণ অন্য কোন বাহ্যিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এই কারণে কোন অর্থনৈতিক সূত্র (economic law) প্রবর্তনের সময়

অর্থনীতিবিদগণ বলতেন যে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে 'ক'-এর বশেষ পরিবর্তনে 'খ'-এর অমুক ধরণের পরিবর্তন হবে। যেমন চাহিদার নিয়ম অনুসারে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে দাম বাড়লে চাহিদা হ্রাস পাবে। কিন্তু বাস্তব সমাজে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকা অসম্ভব। এই কারণে অর্থনৈতিক নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম অর্থনীতিবিদ্‌দের মেনে নিতে হত। এছাড়া মানুষ সবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত আচরণ করে— এই ধারণাও বাস্বসম্মত নয়। অনেকসময়ই মানুষ আবেগতাড়িত হয়ে আচরণ করে। অর্থনীতিতে যা ক্ষতি বলে বিবেচিত হয় মানুষ অনেক সময়ই আদর্শের খাতিরে সেই ক্ষতিই মেনে নেয়।

এই সকল কারণে অর্থনৈতিক আলোচনাকে আরও বাস্তবমুখী করার জন্য বর্তমানে সমাজতত্ত্বের সঙ্গে অর্থনীতির যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার্ট (Sombart), ম্যাক্স হ্বেবার (Max Weber), প্যারেটো (Pareto), ওপেনহাইমার (Oppenheimer) প্রমুখ অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তনেরই একটি দিক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সামগ্রিক সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হ্বেবার তাঁর **The Protest Ethic and the Spirit of Capitalism** শীর্ষক গ্রন্থে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ওপর ধর্মের প্রভাব পড়ে। তিনি দেখিয়েছেন পাশ্চাত্যে প্রগতিশীল প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিবোধ ধনতন্ত্রের দ্রুত বিকাশের সহায়ক হয়েছে, অপরদিকে প্রাচ্যে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের অদৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ধনতন্ত্রের বিকাশের পরিপন্থী হয়েছে। কাজেই অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করতে অন্যান্য সামাজিক বিষয়গুলিরও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সমাজতত্ত্ব অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন বর্তমানে সমাজতত্ত্ব শিল্পায়ন, নগরায়ন, শ্রমবিভাজনের সামাজিক তাৎপর্য প্রভৃতি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করে থাকে। এই ধরণের আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে Industrial Sociology এবং Economic Sociology নামক সমাজতত্ত্বে দুটি স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠেছে।

অপরদিকে কার্ল মার্ক্স, ভেবলেন (Veblen), প্রমুখের মতে সামাজিক ঘটনাসমূহ অর্থনৈতিক বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। অর্থনীতির গবেষণা পদ্ধতিও সমাজতত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে। অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ অর্থনীতির অনুকরণে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় 'মডেল' এর প্রয়োগ করেছেন।

অবশ্য সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক সত্ত্বেও দুটি শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে।

প্রথমত; সমাজতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্র ব্যাপক। সমাজতত্ত্বে সব প্রকার সামাজিক সম্পর্ক আলোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু অর্থনীতি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের আলোচনা করে থাকে।

দ্বিতীয়ত; সমাজতত্ত্ব তুলনামূলকভাবে নবীন সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতির অনেক পরে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে।

তৃতীয়ত; সমাজতত্ত্ব একটি সাধারণ সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি একটি বিশেষ সমাজ বিজ্ঞান।

চতুর্থত; সমাজতত্ত্ব একটি বিমূর্ত বিষয়। সামাজিক চলকগুলিকে সংখ্যায় পরিণত করে পরিমাপ করা কঠিন কাজ। অপরদিকে অর্থনীতির চলকগুলিকে সহজেই এবং সঠিকভাবে পরিমাণগত পরিমাপ করা সম্ভব।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি দুটি স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান, তবে এদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান এবং উভয়েই উভয়ের আলোচনা ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে। এদিক থেকে বলা যায় সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ও একে অপরের পরিপূরক।

উপসংহার

প্রথম পর্যায়ের চারটি এককের মধ্যে দিয়ে সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হল। সমাজতত্ত্ব একমাত্র সমাজবিজ্ঞান যা সামগ্রিক সমাজকে নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতির ন্যায় সমাজের নির্দিষ্ট দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষের সামগ্রিক সামাজিক জীবনই সমাজতত্ত্বের বিবেচ্য। সমাজতত্ত্বের আলোচনার পরিধি নিয়ে বিশ্লেষণাত্মকবাদী ও সংশ্লেষাত্মক বাদীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে দুটি মতবাদ পরস্পরের পরিপূরক। সমাজের বিভিন্ন অংশ পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত— একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করা যায় না— সুতরাং সমাজকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ না করলে সমাজকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। আবার অংশগুলিকে উপেক্ষা করেও সমগ্র সমাজকে বোঝা যায় না। এ প্রসঙ্গে হবহাউসের মত উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সমাজের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তকে একত্রীকরণ করা সমাজতত্ত্বের কাজ। তিনি অবশ্য কোন কৃত্রিম একত্রীকরণের কথা বলেন। যে সকল মৌল ভাবধারা (Central conception) সমগ্র সমাজ জুড়ে রয়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন অংশকে প্রভাবিত করছে— সমাজতত্ত্ববিদের উচিত সেই সকল মৌল ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের বিভিন্ন অংশকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমগ্র সমাজকে বোঝায় প্রয়াস করা।

আলোচনার পদ্ধতি দ্বারা বিচার করলে সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞানের সমগোত্রীয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কোঁৎ যে দৃষ্টবাদের উল্লেখ করেছিলেন বাস্তবে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সেই পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব না হলেও সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ যথাসম্ভব নিজস্ব মূল্যবোধের প্রভাব কাটিয়ে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। এছাড়াও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক বিষয়সমূহের সাধারনীকরণ করা হয়।

সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন কেবল প্রথাগত পদ্ধতিতে জ্ঞান আহরণ নয়, সমাজতাত্ত্বিককে ব্যক্তিগত পরিসরের ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বিষয়সমূহকে ব্যাখ্যা করতে হয়। সমাজতাত্ত্বিকভাবে চিন্তা করতে অর্থাৎ বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়সমূহ দেখতে হলে প্রয়োজন কল্পনার চর্চা। সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা নির্ভর করে 'সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের জ্ঞান থেকে গড়ে ওঠা 'সাধারণ বোধ' থেকে পৃথক হয়ে থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমাজতত্ত্ব মূলতঃ আধুনিক সমাজকে নিয়েই আলোচনা করে থাকে। সমাজতত্ত্ব সমকালীন সমাজের বিভিন্ন বিষয়, সমস্যা, পরিবর্তনের দিকসমূহ বিশ্লেষণ করে থাকে। কাজেই সমকালীন সময়ের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সমাজতত্ত্বের ভূমিকা অপরিসীম। একই সঙ্গে আধুনিক সমাজের প্রেক্ষাপট ও বিবর্তন উপলব্ধি করার জন্য পূর্ববর্তী সনাতন সমাজের অধ্যয়ন প্রয়োজন। উত্তর আধুনিক সমাজ সমসাময়িক সমাজতত্ত্বের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

সমাজের বিভিন্ন দিক আলোচনার জন্য নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতির ন্যায় স্বতন্ত্র সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উভয় শাস্ত্রেরই বিকাশ ঘটায়। তবে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এই পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে শাস্ত্রগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য হারায় না।

অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ (৬ নম্বর)

১. সমাজতত্ত্ব ও সাধারণ বোধের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?

২. উত্তর আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

৩. সনাতন ও আধুনিক সমাজের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

(খ) বিস্তারিত আলোচনা করুন ঃ (১২ নম্বর)

১. সমাজতত্ত্বকে কি বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যায়?

২. 'সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা' সম্পর্কে টীকা লিখুন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ (২০ নম্বর)

১. সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনা করুন।

২. সমাজতত্ত্বের সঙ্গে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Bottomore, T. B. 1971. **Sociology** Bombay : Blackie and Son (India) Ltd.
2. Bhattacharya, D. C. 2008. **Sociology.**
   Kolkata : Vijoya Publishing House.
3. Giddens A. 1989. Sociology. Polity Pres Oxford.

4. Haralambos and Holborn. 2000. **Sociology Themes and Perspectives.** London : Collins Educational.

5. MacIver, R. M. and Page, C. H. 1971. **Society : An Introductory Analysis.**
London : Macmillan.

6. Rao, C. N. S. 2006. **Sociology** New Delhi : S. Chand and Company Ltd.

7. Rawat, H. K. 2007. **Sociology.**
Jaipur : Rawat Publications.

8. কর, পরিমলভূষণ, 1995 সমাজতত্ত্বের রূপরেখা।
কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়

9. চৌধুরী, কৃষ্ণ দাস এবং ঘোষ, শান্তনু 2009. সাম্প্রতিক সমাজতত্ত্ব, কলকাতা ঃ চ্যাটার্জি পাবলিশার্স।